Research Brief

April 2023

সাভারে রানা প্লাজার পাশে পোশাক শ্রমিকরা
// ছবি: ইসমাইল ফেরদৌস, জানুয়ারি ২০২৩

বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের সূচনার পর রাস্তায় কারখানায় নারীদের যাতায়াত করতে দেখা একটি অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল। কেননা, এর আগে নারীরা বেশিরভাগ বাড়িতেই থাকতেন। ৪০ বছরেরও বেশি সময় পর, বাংলাদেশে নারীদের পাবলিক স্পেসে চলাফেরার স্বাধীনতা আরও বেড়েছে, এমনকি ছবির এই মহাসড়কের মতো শহুরে রাস্তায়- যেখানে একসময় দাঁড়িয়ে ছিল রানা প্লাজা কমপ্লেক্স। অথচ জনসম্মুখে নারীর উপস্থিতি তাদের ক্ষমতায়নের মতো নয়: নারী শ্রমিকরা এখনও শিকার হন স্বল্প মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধিনিষেধ এবং কারখানায় যাওয়ার পথে যৌন হয়রানির।

রানা প্লাজার দশ বছর

স্মৃতি, শিক্ষা ও অগ্রগতি

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের পর বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ক দীর্ঘদিন যাবত চলমান সমস্যাগুলো আন্তর্জাতিক আলোচনায় চলে আসে। কিন্তু এই বিপর্যয়ের পরবর্তী এক দশকে আর কী কী ঘটেছে? বিগত এক দশকে দেশের কারখানাগুলোর কাঠামোগত নিরাপত্তা অনেক বেশি জোরদার করা হয়েছে, কারখানায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সংস্কৃতি। উৎপাদনকারীরা এখন কারখানার নিরাপত্তা তদারকির জন্য শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় বসতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও, বাংলাদেশে শ্রমিক মজুরি রয়ে গেছে বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরির তালিকায়, যে মজুরিতে শ্রমিকদের দৈনন্দিন খাওয়া-পরা এবং বাড়ি ভাড়া দেয়াও দুস্কর। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে না দেয়ার প্রচেষ্টারই একটি সরাসরি দৃশ্যমান ফলাফল হলো এই স্বল্প মজুরি- যা কারখানা মালিকদের রাজনৈতিক ক্ষমতারও আভাস দেয়। বাংলাদেশের ফ্ল্যাগশিপ তৈরি পোশাক শিল্প বিগত দশ বছরে ক্রমশ বর্ধিষ্ণু হয়েছে; বর্তমানে প্রায় চার লাখ শ্রমিক এই শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। দেশের রপ্তানীখাতের ৮২% আসে পোশাক শিল্প থেকে, মোট জিডিপির ৯.২৫% যোগান দিচ্ছে এই শিল্প।[i] উন্নয়নের এই 'সস্তা শ্রম' মডেল কি বাংলাদেশের উন্নয়নের সাফল্য, নারীর ক্ষমতায়নের অগ্রগতি কিংবা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? এ প্রশ্নগুলোই এখানে করা হয়েছে। এছাড়া বিগত এক দশকে কীভাবে রানা প্লাজার বিপর্যয়কে স্মরণ করা হয়েছে, এ থেকে কি শিক্ষা নেয়া হয়েছে, তৈরি পোশাক শিল্পে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে এবং বাংলাদেশে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী একটি পোশাক শিল্প গড়ে তুলতে কি ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত- সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।[ii]

স্মরণে রানা প্লাজা

২০১৩ সালের ২৪ শে এপ্রিল সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বস অন্তত ১১৩২ জন পোশাক শ্রমিকের প্রাণ কেড়ে নেয়, ২৫০০ জন শ্রমিককে আহত করে এবং হাজার হাজার পরিবার, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষকে বাকরুদ্ধ করে দেয়। ভবনটি অনিরাপদ বলে বন্ধ ঘোষণা করার ঠিক একদিন পরই শ্রমিকদের জোর করে কাজ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রানা প্লাজায় আনা হয়। অথচ, রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের মাত্র পাঁচ মাস আগেই তাজরিন ফ্যাশনসের অগ্নিকান্ডে ১১২ জন শ্রমিক মারা যায়। পরপর ঘটে যাওয়া এইসব ভয়াবহ ঘটনা বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের নাজুক পরিস্থিতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গোটা বিশ্বকে সোচ্চার করে তোলে।

সাভারের রানা প্লাজায় শ্রমিক ভাস্কর্য
// ছবি: ইসমাইল ফেরদৌস, জানুয়ারি ২০২৩

একসময় যেখানে দাড়িয়ে ছিল রানা প্লাজা কারখানা কমপ্লেক্স, সেটি এখন একটি পরিত্যক্ত জায়গা। এখানে শ্রমিকদের দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তি ছাড়া আর কোনো স্মৃতিসৌধ নেই; আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড, বিজিএমইএ বা বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ানক শিল্প বিপর্যয়ের শিকারদের স্মরণ করার মতো কিছুই না।

নীতিনির্ধারনী ও একাডেমিক গবেষণায় গবেষকগণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও অধিকারকর্মীরা তাঁদের কর্মকান্ডে এই বিপর্যয়টিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নানানভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু মাত্র দশ বছর যেতে না যেতেই দেশের মূল অর্থনৈতিক খাতে ঘটে যাওয়া এত ভয়াবহ একটি বিপর্যয় জনসাধারণের কাছে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে বলেই দেখা যায়। তরুণ প্রজন্ম, এমনকি অনেক তরুণ পোশাক শ্রমিকও রানা প্লাজার ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না। এই বিপর্যয়টিকে কেন্দ্র করে নেই কোনো রাষ্ট্রীয় ছুটি বা দিবস। এই বিপর্যয়ের বার্ষিক উদযাপন প্রতি বছর বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি ও দৈন্যদশার ওপর দৃষ্টি টেনে আনবে বলে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানী সংস্থাও (বিজিএমইএ) একে এড়িয়ে যায়। জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় নীতিগত নথিপত্রে রানা প্লাজা বিপর্যয়ের কথা চোখে পড়ে না। বিপর্যয়ের স্মরণে একমাত্র স্মৃতিস্তম্ভটিও শ্রমিকরা নিজেরাই নির্মাণ করেছিলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত জমির ওপর। প্রাথমিকভাবে সরকার এই জমি শ্রমিকদের কাছে হাসপাতাল বা স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরীর উদ্দেশ্যে সমর্পন করবে বলে কথা দিলেও- নিরবে এই প্রতিজ্ঞা পাশ কাটানো হয়েছে; যদিও শ্রমিক সমর্থকরা তা ভুলে যায়নি।

বিপর্যয়ের শিক্ষা ও পরবর্তী পদক্ষেপ

কারখানা নিরাপত্তার ইস্যুতে নতুন মৈত্রী

রানা প্লাজা বিপর্যয় বৈশ্বিক মূল্য সংযোগে সুশাসনের নতুন নিয়ম নীতি গ্রহনে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বিপর্যয়ের পর পোশাক শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে মোট তিনটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মাঝে Sustainability Compact for Continuous Improvements in Labour Rights and Factory Safety in the Ready-Made Garment and Knitwear Industry in Bangladesh - শিরোনামে প্রথম উদ্যোগটি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপীয় কমিশন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মাঝে। এটি শ্রমাধিকার, নিরাপদ কারখানা/ কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের প্রতি সম্মান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নকে একীভূত করে। গৃহীত তিনটি উদ্যোগের মাঝে সবচেয়ে বড় এবং উদ্ভাবনী ছিল The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh; এতে প্রায় ২০০টির বেশি শ্রমিক ইউনিয়ন ও প্রায় সবগুলো ইউরোপিয় ব্র্যান্ড একটি আইনি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর আওতায় পোশাক সরবরাহকারী কারখানাসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিরাপত্তার মানোন্নয়ন করতে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা অভিযোগের প্রক্রিয়া স্থাপন করতে বলা হয় । Alliance for Bangladesh Worker Safety

নামে পরিচিত তৃতীয় উদ্যোগটি নেয়া হয় ২৯টি মার্কিন ব্র্যান্ডের মধ্যস্থতায়। পাঁচ বছর মেয়াদী এই স্বেচ্ছাধীন উদ্যোগটির অধীনে ব্যাপক আকারে প্রশিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এর জন্য চুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছে ব্র্যান্ডগুলোর স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ এবং পোশাক সরবরাহকারীদের নিরাপত্তার মান মেনে চলার স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার ওপর।[iii]

সার্বিকভাবে Accord মডেলটিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে একটি সফল উদ্যোগ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় এবং পরবর্তীতে মডেলটি পাকিস্তানেও গৃহীত হয়। বাংলাদেশী পোশাক সরবারহকারীরা বাংলাদেশের আইন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নিয়ম মেনে কারখানার নিরাপত্তার মানোন্নোয়নে বাধ্য থাকলেও এর জন্য তারা প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান পায়নি; যার জন্য বেশীরভাগ কারখানাকেই মোটা অংকের ঋণ করতে হয়েছে।[iv] ২০১৭ সালে এই কাজটিতে সহায়তা করার জন্য Accord-এর অধীনে Factory Remediation Fund নামে ১.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হয়।[v] ২০১৯ সালে এসে Accord বাংলাদেশী নেতৃত্বে RMG Sustainability Council (RSC)-এ রুপান্তরিত হয়। RMG Sustainability Council (RSC) মূলত Accord -এর অবকাঠামোর আলোকেই নির্মিত হয়; যার অধীনে বাংলাদেশী পোশাক নির্মাতা ও শ্রমিক ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা পর্ষদ তৈরী করা হয়। কিন্তু অন্যদিকে, এখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রভাবকে সীমিতও করে ফেলা হয়। Accord এর পরিচালনা পর্ষদে যেখানে অর্ধেক আসনই ছিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের, সেখানে RMG Sustainability Council (RSC)-এ শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ রাখা হয়। শ্রমিকদের অমীমাংসিত অভিযোগগুলিকে সুনির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় সমর্থন করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক ইউনিয়ন,আন্তর্জাতিক ক্রেতাগোষ্ঠী এবং ব্র্যান্ডগুলির মাঝে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে তখন থেকেই আলোচনা শুরু হয়।

বৈশ্বিক মূল্য সংযোগে আইনি জবাবদিহিতা

রানা প্লাজার বিপর্যয় দেখিয়ে দেয় যে, মূল্য সংযোগের তলানিতে অবস্থানরত শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থার দায় সমানভাবে মূল্য সংযোগের শীর্ষে বসবাসকারী আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর ওপরেও বর্তায়। আর তা বৈশ্বিক মূল্য সংযোগের উপযুক্ত পরিচালনার ব্যাপারে নতুন করে ভাবার তাগাদাও দেয়। রানা প্লাজা পরবর্তী সময় বেশ কিছু বিদেশী সরকার কর্মচারি আঘাত বীমা, সামাজিক সংলাপ এবং উন্নত কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু অন্যদিকে, কানাডার আদালতের মাধ্যমে রানা প্লাজার বিপর্যয়ের পেছনে সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ওপর দায় বর্তানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।[vi] আবার Accord আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনি এখতিয়ারে সরবরাহ ব্যবস্থায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলিকে দায়ী করে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে- যা mandatory human rights and due diligence (MHRDD) আইনের কাঠামোকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।[vii] রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর ফ্রান্স একটি

কন্যা রিফির সাথে লতিফা লিপি
// ছবি: ইসমাইল ফেরদৌস, জানুয়ারি ২০২৩

লতিফা লিপি ও তার চার বোন সবাই রানা প্লাজা ভবনে কাজ করতেন। ভবন ধ্বসে এক বোন নিহত হয়েছেন। ঘটনার সময় লতিফা ৬ তলায় কাজ করছিলেন এবং প্রায় ১২ ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে ছিলেন। তিনি মাথা, পা এবং পেটে আঘাত পেয়েছেন; ক্ষতিপূরণের ১৫০,০০০ টাকার বেশিরভাগই চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হয়। বিপর্যয়ের পর থেকে, লতিফার পক্ষে চাকরী করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়: তার চোখে ও পায়ে সমস্যা দেখা দেয়। আবার মজুরি বৃদ্ধি পেলেও, উচ্চ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বেড়েছে কাজের চাপও। লতিফা লিপি এবং তার স্বামী তাঁদের স্বল্প উপার্জনে মেয়ের পড়ালেখার খরচ চালাতে পারেন না বলে সম্প্রতি তাদের মেয়ে রিফিকে মাদ্রাসা থেকে বাড়ি নিয়ে আসেন। তাঁদের বাড়ি রানা প্লাজার খুব কাছাকাছিই, সেখানে কোনও সরকারি স্কুলও নেই। লতিফা লিপির কি কারখানার প্রতি কোনো দাবি আছে? হ্যাঁ আছে! রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর দুইবার তাকে অন্যায়ভাবে কারখানা থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে; এই কারখানাগুলো তার ঈদ বোনাস এবং মাতৃত্বকালীন ছুটিও দিতে চায়নি। লতিফা লিপি বলেনে, "আমি আমার উপার্জনের প্রাপ্য টাকাটাই চাচ্ছি, আর তো কিছু না!"

যথাযথ শ্রম আইন গ্রহণ করে যা সাপ্লাই চেইনে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর সরাসরি দায় গ্রহণের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করে। এই আইনটি United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights এর উপর ভিত্তি করে, ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব এবং কার্যক্রমের সাথে জড়িত মানবাধিকার সম্পর্কিত ঝুঁকি সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং হ্রাসে দায়িত্ব গ্রহণ করার একটি রূপরেখা তৈরী করে।[viii] অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নও mandatory human rights and due diligence (MHRDD) আইন তৈরির ব্যাপারে কাজ করছে। একইসাথে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডরা যেন নিজেদের দায় নেয় সেজন্য বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোও কাজ করছে। শ্রমিকরা এইধরণের আইনকে কীভাবে ব্যবহার করবে কিংবা আদৌ ব্যবহার করতে পারবে কি না তা স্পষ্ট না হলেও এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্র্যান্ডগুলোর ওপর তাদের সাপ্লাই চেইনের তদারকি উন্নত করতে এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক অধিকার আরও ভালভাবে মূল্যায়ন করতে চাপ প্রয়োগ করা হবে।

জাতীয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা

রানা প্লাজা বিপর্যয়ের আগে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত অনেকাংশেই স্বায়ত্বশাসিত ছিল। কিন্তু বিপর্যয়ের পর বাংলাদেশ সরকার কারখানা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য আগের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে। প্রবিধানটিকে শক্তিশালী করার বেশকিছু সরকারি প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং একইসাথে মজুরি বোর্ডের কার্যক্রম সংশোধন ও সংস্কার করা। ২০১৩ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইনের কিছু বিধানে মৃত্যু ও অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং শ্রমিক অংশগ্রহণমূলক কমিটি ইত্যাদি বিষয় সংশোধন করা হয়। কিন্তু, এরপরও দেশে ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া আমলাতান্ত্রিক থেকে যাওয়ায় নতুন ইউনিয়ন নিবন্ধনের অগ্রগতি অচিরেই থমকে যায়।[ix]

সরবরাহকারী কারখানাগুলোর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিই পরবর্তীতে রপ্তানিকারক কারখানাগুলোকে নিয়ে ম্যাপড ইন বাংলাদেশ (MiB) ডাটাবেস তৈরির মতো উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করেছে। MiB হচ্ছে ব্র্যান্ড, সরকার, এনজিও, কারখানা এবং বিশেষজ্ঞদের একটি মাল্টি-স্টেকহোল্ডার উদ্যোগ। এর উদ্দেশ্য হলো সমস্ত রপ্তানিকারক কারখানার বিবরণ যেমন অবস্থান, রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা, বিল্ডিংয়ের ধরন, শ্রমিক এবং সার্টিফিকেশনের বিবরণ রেকর্ড করা, যাতে নিয়ম না মানা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নজরদারি এবং সনাক্ত করা যায়।[x]

কারখানাগুলোর পরিবর্তিত আচরণ

রানা প্লাজা ধ্বসের পরবর্তী সময়ে কারখানার ভবনগুলিকে আরও নিরাপদ করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায় এবং নির্মাতারা সবাই সম্মত হন যে কারখানার মৌলিক নিরাপত্তা মানগুলি অবশ্যই আরও সুসংহত করতে হবে এবং তা বজায় রাখতে হবে। Accord এর ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, সদস্য কারখানাগুলোর মাঝে ৯৩% কারখানায় প্রাথমিক কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে; মোট ১,৩০০টি শ্রমিক নিরাপত্তা কমিটিকে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা মোকাবেলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে; এবং প্রায় ১.৮ মিলিয়ন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। মোট তিনটি নিরাপত্তা উদ্যোগ বিদ্যমান থাকলেও, সবগুলো কারখানাকে এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। আবার, এই তিনটি উদ্যোগের যেটির অধীনে পরিদর্শন করা হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে পরিদর্শিত কারখানাগুলির নিরাপত্তার মাত্রার মাঝেও তারতম্য দেখা যায়। Accord এর সমাপ্তি এবং RSC-তে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে, RSC-এর নেতৃত্বাধীন কারখানাসমূহে সংস্কারের অগ্রগতি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। বয়লার এবং গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এখনও বিদ্যমান নিরাপত্তা উদ্যোগের আওতায় আসেনি।[xi] এমন একটি প্রেক্ষাপটে, যেখানে স্বল্প মজুরি এবং চাকরির অনিশ্চয়তা শ্রমিকদের দীর্ঘ সময় বিপজ্জনক কাজের পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য করে, সেখানে শুধুমাত্র কারখানার কাঠামোগত নিরাপত্তা শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।[xii] শ্রমিকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের পর থেকে কারখানাগুলোতে উৎপাদন বাড়ানোর চাপ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য শ্রমিকদের প্রতিদিনের পোশাক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ও নজরদারী এতটাই বাড়ানো হয়েছে যে, এক গ্লাস পানি খাওয়া বা, প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত শ্রমিকরা পায় না। অন্যদিকে, শ্রমিকদের কাছে জবাবদিহিতা জোরদার করার জন্য Accord এর অধীনে একটি অভিযোগ গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থাপন করা হয়, কিন্তু RSC-এর অধীনে তা কতটা কার্যকর সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো বিশ্লেষণ হয়নি।

সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও দরকষাকষির অধিকার

শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা এবং সম্মিলিত পদক্ষেপ নেয়ার অধিকারকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাকে যদি কারখানার কাঠামোগত নিরাপত্তা বৃদ্ধির উদ্যোগের সাথে তুলনা করা হয়, দেখা যাবে তা খুব একটা সফল হয় নি।। যদিও Accord এবং তার উত্তরসূরী RSC পরিচালনা পর্ষদে শ্রমিক সংগঠনগুলোর জন্য জায়গা তৈরি করেছে, তারপরও মালিকপক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন বিদ্বেষীই রয়ে গেছে। রানা প্লাজা-পরবর্তী সময়ে, ২০১৩ সালের

নারায়ণগঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে শ্রমিকদের অভিযোগ ফাইল।
// ছবি: ইসমাইল ফেরদৌস, জানুয়ারি ২০২৩

রানা প্লাজা বিপর্যয় পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হল অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতির প্রবর্তন। এখন শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ করলে, আইনি বাধ্যবাধকতামূলক ব্যবস্থার কারণে সুরাহা পায়। কিন্তু শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হলেই তাদের মজুরি বা অন্যান্য সুবিধা না পাওয়ার অভিযোগের সুরাহা হয়।

সংশোধিত শ্রম আইনের অধীনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রক্রিয়াটি কিছুটা সুগম করা হয়েছিল। পরবর্তিতে, ২০১৮ সালের সংশোধনীতে ২০% শ্রমিকের অংশগ্রহণে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ করে দেয়া হয়, যা আগে ছিল ৩০%। এর ফলে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা প্রাথমিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও, একটির পর একটি ট্রেড ইউনিয়নের আবেদন বাতিল হতে থাকে এবং কয়েক বছরের মাঝেই এই অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়।[xiii] শ্রমিক সংগঠনগুলোর মতে, সাধারণত কারখানা কর্তৃপক্ষের মদদে তৈরি হওয়া হলুদ ট্রেড ইউনিয়নগুলোই শেষপর্যন্ত নিবন্ধন পায়; অথচ, রাজনৈতিক ও মালিকপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে নিবন্ধন পেতে যুদ্ধ করতে হয়।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন বিতর্কিত রয়ে গেছে, যার জন্য Worker Participation অথবা Safety কমিটিগুলোকে ঘিরে অনেক আশার সঞ্চার হয়েছে; এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে শ্রমিকরা কারখানা পর্যায়ের সমস্যা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি গঠনমূলক আলোচনা করতে পারে। সংশোধিত শ্রম আইনে এই কমিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এই কমিটিগুলো কারখানা পর্যায়ে কাজের অবস্থা এবং শিল্প সম্পর্কের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারলেও, কোনভাবেই আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। কেননা, তারা বিরোধ সম্পর্কিত আলোচনার (উদাহরণস্বরূপ, অন্যায্য বরখাস্ত বা, মজুরি চুরি) বা দ্বিপাক্ষিক দর কষাকষির সুযোগও পায় না।[xiv]

ক্ষতিপূরণ এবং কর্মচারি আঘাত বীমা

রানা প্লাজা বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ছিল আংশিক এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। ২০১৪ সালে আইএলও (ILO) রানা প্লাজা ডোনারস ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করে।[xv] আইএলও উপযুক্ত সুবিধাভোগীদের দাবির ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ট্রাষ্টে অন্তর্ভুক্ত করে এবং অর্থ সংগ্রহ করে। এই তহবিলের সিংহভাগই আসে আন্তর্জাতিক পোশাকের ব্র্যান্ড, বেনামী দাতা এবং ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অনুদান আসে বলে জানা যায়।[xvi] কিন্তু এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগের জরুরি তহবিলগুলো কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। শেষ পর্যন্ত, রানা প্লাজা বিপর্যয়ের শিকার ব্যক্তি এবং পরিবারগুলি এই ব্যবস্থার অধীনে স্বীকৃত স্কিমগুলি থেকে ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কিছু বেশি আর্থিক সহায়তা পেয়েছে।[xvii] কিন্তু

রানা প্লাজা বিপর্যয় থেকে বেঁচে ফেরা শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানাণ অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করেছেন; যেমন তাঁদের চিকিৎসার পেছনেই অধিকাংশ টাকা খরচ হয়ে গেছে; এবং তাঁদের মতে এই ধরনের অর্থ প্রদান করা উচিত আহত শ্রমিকদের অধিকার হিসাবে, অনুদান হিসাবে নয়। অনেকেই পোশাক কারখানার চাকরিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টার কথাও উল্লেখ করেছেন; উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা- অথচ শারীরিক ও মানসিক আঘাতের জন্য কোন কাজ তাঁরা করতে পারেন নি। ক্ষতিপূরণের অন্যায্য, বিলম্বিত এবং অসংগত প্রক্রিয়া কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবিকে ত্বরান্বিত করে। ২০২২ সালে তৈরি পোশাক শিল্পে একটি পরীক্ষামূলক কর্মসংস্থান বীমা প্রকল্প চালু করা হয়, যার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল পোশাক শিল্পের কর্মক্ষেত্রে আঘাতের মাত্রা এবং ধরণ চিহ্নিত করা এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা খরচ, এবং ঝুঁকি-বন্টন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা; যার মাধ্যমে ব্র্যান্ডগুলি বিদ্যমান কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থায়নে অবদান রাখতে পারে।[xviii]

অগ্রগতি: যা করা বাকি

রানা প্লাজা ঘটনার পর থেকে কারখানার নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়। অথচ একই সাথে শ্রমিকদের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হচ্ছে এবং আর্থিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। রানা প্লাজার ধ্বস থেকে রক্ষা পাওয়া শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জটিলতাগুলো মূল্যায়ন করার জন্য কোনও নিয়মতান্ত্রিক ফলোআপ করা হয়নি। বেঁচে থাকা এই শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা যায়, তারা এমনকি সন্তানের পড়ালেখার খরচ চালানোর মত আয়ের কাজ করতেও এখন অপারগ। রানা প্লাজা পরবর্তী অগ্রাধিকার কোনটি? একুশ শতকের মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি পোশাক শিল্প খাত গড়ে তুলতে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

বৈশ্বিক মূল্য সংযোগের সংস্কার

গত ১০ বছরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা যে ইতিবাচক ফলাফলগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন তার বেশিরভাগই এসেছে শ্রমিকদের জন্য জরুরি ইস্যুগুলো নিয়ে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারণার সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে। গৃহীত তিনটি নিরাপত্তা উদ্যোগ সরকার, নির্মাতা এবং ব্র্যান্ডগুলোকে শ্রমিক নিরাপত্তা ইস্যুতে কাজ করতে সচেষ্ট করেছে। RSC প্রতিষ্ঠার আগে, বিজিএমইএ (BGMEA) জাতীয় বা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে দর কষাকষি বা, সমন্বয়ের কোন উদ্যোগ নেয়নি।

অপরদিকে, আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো ধারাবাহিকভাবে পণ্যের দাম কমিয়েছে এবং আর্থিক লেনদেনে বিলম্বের মাধ্যমে নির্মাতাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেছে। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে, অর্থাৎ রানা প্লাজা বিপর্যয় থেকে শুরু করে, কারখানার নিরাপত্তা ব্যয় এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলাদেশী কারখানাগুলোতে প্রদত্ত মূল্য প্রায় ৮% হ্রাস পেয়েছে।[xix] আবার কোভিড-১৯ মহামারীও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, কীভাবে বৈশ্বিক মূল্য সংযোগে শ্রমিকদের অধিকার অবাধে লঙ্ঘন করা হয়। কোভিডের সময় আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলি প্রায় ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ডার বাতিল করে, যার ফলে লাখ লাখ পোশাক শ্রমিক তাঁদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হন এবং চাকরি হারান। একই সাথে পণ্যের দাম কমাতে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর প্রয়োগ করা ক্রমাগত চাপ শ্রমিকদের অধিকার অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়। আন্তর্জাতিক এবং বাংলাদেশি শ্রমিক সংগঠনগুলো মহামারী চলাকালীন BGMEA-কে বাতিল হওয়া অর্ডারগুলির জন্য অর্থ প্রদানের দাবিতে সাহায্য করে, এবং তাতে কিছুটা সাফল্যও আসে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করছে শ্রমিক, মালিকপক্ষ এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আরও দৃঢ় ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতার ওপর। এই ধরনের ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতাই পারস্পরিক আস্থা ও গঠনমূলক সম্পৃক্ততা গড়ে তুলতে পারে।

সামাজিক নিরাপত্তা

রানা প্লাজা বিপর্যয় আমাদের দেখিয়েছে যে, শ্রমিকরা যদি মনে করে তাদের আর কোনও বিকল্প নেই, তারা বাধ্য হয় বিপজ্জনক কর্মক্ষেত্রে যেতে । পরবর্তিতে কোভিড-১৯ মহামারী আবারও আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, শ্রমিকদের নিরাপত্তার অভাব; শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে অপারগ এবং প্রচন্ডভাবে সংক্রমনের ঝুঁকিতে তাদের অবস্থান। একই সাথে, শ্রমিকরা মালিক পক্ষের কাছ থেকে প্রতারিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোর অর্ডার বাতিল করার সিদ্ধান্তে একটি নেতিবাচক প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে। এইসব কারণেই জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তার একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য মূল অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সামাজিক নিরাপত্তার মাঝে রয়েছে জরুরী অবস্থার সময় নগদ সহায়তা বা, ভর্তুকি (যেমন মহামারী, খাদ্য মূল্য সংকট, জলবায়ু সংকট এবং শিল্প বিপর্যয়); স্বাস্থ্য এবং বেকারত্ব বীমা চূড়ান্ত করা; এবং কর্মচারি আঘাত বীমা প্রকল্পটিকে বৃহৎ পরিসরে বাস্তবায়ন করা। একটি কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে তা শুধুমাত্র শ্রমিকদের দুর্যোগ থেকে রক্ষা করতেই সাহায্য করত না, এমনকি পরবর্তীতে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সাহায্য করত। উৎপাদনকারী এবং মালিকপক্ষও পোশাক শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে আগ্রহী, কেননা এতে শ্রমিকদের

ইয়াসমিন আক্তার, নারায়নগঞ্জ।
// ছবি: ইসমাইল ফেরদৌস, জানুয়ারি ২০২৩

রানা প্লাজার বিপর্যয়ের সময় ইয়াসমিন আক্তারের কাজের এক বছর চলছিল। "আমরা কারখানার ম্যানেজারদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে ভবনটি ভেঙে গেছে। রানা প্লাজা ভেঙ্গে গেছে বলে তারা আমাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিল। আমি অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম, একসাথে এতগুলি জীবন হারিয়ে গেছে ভেবে আমার অনেক কষ্ট লেগেছিল। বাড়িতে যাওয়ার পর আমার অনেক কষ্ট লেগেছে।" তিনি বলেন, "সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মজুরি। আমাদের যে পরিমাণ কাজ করতে হবে, সেই তুলনায় মজুরি আমাদের চাহিদা পূরণ করছে না। আমাদের মজুরি খুব কমই বাড়ে। আর মজুরি বাড়ানো হলে, আমাদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। পিপাসায় পানি খেতে চাইলে আমাদের বলে যে কাজ করতে হবে। টার্গেট পূরণ করিনি কেন জিজ্ঞেস করে। এমনকি আমাদের নামাজের বিরতি নিতে দেওয়া হয় না। শুধু কাজ আর কাজ। কাজ ছাড়া আর কিছু নেই। আপনি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না, আমরা কতটা কাজের চাপে থাকি সব সময়. কাজ ছাড়া কিছুই নেই। আমরা এখন একা দুই-তিনজন শ্রমিকের কাজ করি। আগে শ্রমিক ছিল ১১০/১২০ জন, আর এখন একই পরিমাণ কাজ করতে হয় ৬০/৭০ জনকে। কিন্তু মজুরি যদি ভালো হতো, তাহলে অসুবিধাটা তেমন একটা ব্যাপার ছিল না। আমরা ভালো বেতন পেলে সন্তানদের সঠিকভাবে শিক্ষিত করতে পারতাম। তারা কম্পিউটারে অনেক কিছু শিখতে পারত। আমার ছেলেটাকে কম্পিউটার দেওয়ার সামর্থ্য নেই বলে আমি অনেক কেঁদেছি।"

স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক খরচ ব্র্যান্ডগুলোকে সরবরাহ করা পণ্যের মূল্যের মধ্যে গণনা করা উচিত।

উপযুক্ত মজুরি

বাংলাদেশি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি এখনও বিশ্বের সর্বনিম্ন মজুরির তালিকায় অন্যতম। রানা প্লাজার বিপর্যয়ের পর থেকে বারবার শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে আসায় ন্যূনতম মজুরি কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিশেষ করে খাদ্য, জ্বালানি এবং বাসস্থানের মূল্য বৃদ্ধি ধর্তব্যে আনলে দেখা যায়, প্রকৃত অর্থে, শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পেয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে চার সদস্যের একটি পরিবারে শুধুমাত্র খাবারের জন্যই প্রতি মাসে কমপক্ষে ২২,৪২১ টাকা প্রয়োজন- যা পোশাক শ্রমিকদের গড় বেতনের তিনগুণ।[xx] অপরদিকে, কোভিড-১৯ মহামারীকালীন অনেক শ্রমিক বেতন হারিয়েছে বা, ছাঁটাই হয়েছে।[xxi] এই প্রেক্ষাপটে জরুরী অগ্রাধিকার হলো বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়াটির সংস্কার, যেন পোশাক শ্রমিকদের মজুরি পাঁচ বছরের পরিবর্তে জরুরী অবস্থায় আরও দ্রুত সমন্বয় করা যায়। মোটাদাগে, মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরির হার বাড়াতে হবে।

শ্রমিকের কণ্ঠস্বর

স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার ছাড়া শ্রমিকরা কখনোই উপযুক্ত বা, ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে পারবে না। তারা যদি সংস্কারের পক্ষে থাকে তাহলে তাদের নজরদারিতে রাখা হয় অথবা, রাজনৈতিক বা, অন্য কোনো স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক স্বার্থ থেকে বেরিয়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। শ্রমিকের কণ্ঠস্বরকে অবশ্যই জননীতির আওতাভুক্ত করতে হবে, বিশেষ করে শিল্পোন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার সম্পর্কে। বাংলাদেশ যদি একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে চায় যে দেশ নারীর ক্ষমতায়ন, সাফল্য এবং উন্নয়ন নিয়ে গর্ব করে, তাহলে শ্রম আইনের যে বিধানগুলি ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি দেয়, সেগুলোকে অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে।

Endnotes

i. Export Promotion Bureau Annual Report 2021-2022 (www.epb.gov.bd/); Quarterly Review on Readymade Garments (RMG)1: October-December FY'23 (www.bb.org.bd).

ii. This report was collaboratively authored by Maheen Sultan, Iffat Jahan Antara, and Touhidul Islam, and was published by the BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) with support from 21st Century ILGWU Heritage Fund. Kalpona Akter, Debra Efroymson, Ismail Ferdous, Judy Gearhart, and Naomi Hossain also contributed to the report. The preliminary findings of the report were shared with RMG workers in February 2023.

iii. Gearhart, J. (2023). Local voices, global action: Transnational organizing in apparel supply chains (ARC working paper). Accountability Research Center. https://accountabilityresearch.org/publication/transnational-organizing-apparel-supply-chains/

iv. Moazzem, K. G., & Khandker, A. (2016). Post-Rana Plaza developments in Bangladesh: Towards building a responsible supply chain in the apparel sector. Centre for Policy Dialogue (CPD) and Pathak Shamabesh.

v. https://bangladeshaccord.org/updates/2020/08/20/overview-of-the-factory-remediation-fund-closed-on-31st-may-2020

vi. Doorey, D. J. (2018). Rana Plaza, Loblaw, and the disconnect between legal formality and corporate social responsibility. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3265826

vii. Gearhart, J. (2023). Local voices, global action: Transnational organizing in apparel supply chains (ARC working paper). Accountability Research Center. https://accountabilityresearch.org/publication/transnational-organizing-apparel-supply-chains/

viii. https://www.industriall-union.org/due-diligence-has-france-really-laid-the-foundations-to-end-corporate-impunity

ix. Rahman, M., & Moazzem, K. G. (2017). The legacy of Rana Plaza: Improving labour and social standards in Bangladesh's apparel industry. In A. Hira & M. Benson-Rea (Eds.), *Governing corporate social responsibility in the apparel industry after Rana Plaza*, (pp. 81–109).

x. https://mappedinbangladesh.org/

xi. Moazzem, K. G., & Mostofa, M. S. (2021). Industrial Safety in the RMG Sector in the Post-Accord-Alliance Era: Is the Institutionalisation Process Slowing Down? Dhaka: Centre for Policy Dialogue (CPD) and Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bangladesh.

xii. Ashraf, H. (2017). Beyond building safety: An ethnographic account of health and well-being on the Bangladesh garment shop floor. In R. Prentice & G. De Neve (Eds.), *Unmaking the global sweatshop: Health and safety of the world's garment workers* (pp. 250–274).

xiii. Department of Labour trade union registration data can be found here: http://103.48.18.197/en/trade. See also Alamgir, F., & Banerjee, S. B. (2019). Contested compliance regimes in global production networks: Insights from the Bangladesh garment industry. *Human Relations*, *72*(2), 272–297 and Ahmed, M. S., & Uddin, S. (2022). Workplace bullying and intensification of labour controls in the clothing supply chain: Post-Rana Plaza disaster. *Work, Employment and Society*, *36*(3), 539–556.

xiv. Kabeer, N., Huq, L., & Sulaiman, M. (2019). Multi-stakeholder initiatives in Bangladesh after Rana Plaza: Global norms and workers' perspectives (Garment Supply Chain Governance Discussion Paper Series No. 01/2019). Garment Supply Chain Governance Project. https://www.wiwiss.fu-berlin.de/forschung/Garments/Medien/Discussion-Paper-Garment-Governance-01-2019_Mulit-stakeholder-initaitves-in-Bangladesh-after-Rana-Plaza.pdf

xv. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_431795.pdf#page39

xvi. https://ranaplaza-arrangement.org/about

xvii. https://ranaplaza-arrangement.org/trustfund/

xviii. https://www.ilo.org/global/topics/geip/news/WCMS_849244/lang--en/index.htm

xix. Anner, M. (2020). Squeezing workers' rights in global supply chains: Purchasing practices in the Bangladesh garment export sector in comparative perspective. *Review of International Political Economy*, *27*(2), 320–347. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1625426

xx. https://www.observerbd.com/news.php?id=389238

xxi. https://api.fairwear.org/wp-content/uploads/2021/07/The-impact-of-the-Covid-pandemic-on-garment-workers-with-a-specific-focus-on-women-workers.pdf

© 2023 BIGD, Brac University // Design: Abdur Razzaque